بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২০ জুন, ২০২৫ মোতাবেক ২০ এহসান, ১৪০৪ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

মক্কা বিজয় সম্পর্কে আলোচনা অব্যাহত আছে। এর জন্য যাত্রা করার পূর্বে একটি ঘটনারও উল্লেখ পাওয়া যায় যাতে উল্লেখ রয়েছে, একজন সাহাবী না বুঝেই মহানবী (সা.)-এর সফরের খবর মক্কাবাসীদের দেবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তার কাছে এর সংবাদ প্রকাশ করে দেন। আর এভাবে মহানবী (সা.)-এর এই পরিকল্পনার খবর কাফিরদের কাছে পৌঁছতে পারে নি। এর বিস্তারিত বিবরণে লেখা আছে, মদীনায় যখন মক্কা যাবার প্রস্তুতি শুরু হয়, তখন হযরত হাতেব বিন আবি বালতা নামের একজন বদরী সাহাবী, যিনি মদীনায় উপস্থিত ছিলেন, কুরাইশের উদ্দেশ্যে একটি পত্র লেখেন। যার মাঝে তিনি লেখেন, আল্লাহ্র রসূল (সা.) তোমাদের দিকে রওয়ানা হবার পরিকল্পনা করেছেন। তিনি পত্রটি একজন মহিলার কাছে সোপর্দ করেন, যার সম্পর্ক ছিল মুযায়নাহ গোত্রের সাথে। এই মহিলার নাম ছিল কুনুদ বা সারাহ। সে বনু আব্দুল মুত্তালিবের এক ব্যক্তির দাসী ছিল। তিনি এই পত্র মক্কাবাসীদের কাছে পৌঁছে দেবার শর্তে তার জন্য পারিশ্রমিক নির্ধারণ করেন এবং যতটা সম্ভব এই পত্রটি গোপন রাখতে বলেন আর সাধারণ পথে যেতে নিষেধ করেন, কারণ সেখানে প্রহরা ছিল। উক্ত মহিলা পত্রটি মাথার চুলের মধ্যে রাখে এবং বেণী বেঁধে নেয়, তারপর পত্র নিয়ে রওয়ানা হয়। এই পত্রে লেখা ছিল, মহানবী (সা.) তোমাদের দিকে এমন এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসছেন যা রাতের মতো (অর্থাৎ অত্যন্ত বিশাল সৈন্যবাহিনী) এবং প্রবল বন্যার মতো দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে। আর আমি আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, তিনি যদি একাকীও তোমাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন, তবুও তোমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ অবশ্যই তাঁকে সাহায্য করবেন এবং খোদা তাঁর সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন যা তিনি তাঁর (সা.) সাথে করেছেন। তাই তোমরা তোমাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে নাও।

অপর এক বর্ণনায় এটাও লেখা আছে, মুহাম্মদ (সা.) সৈন্যবাহিনী নিয়ে বের হতে যাচ্ছেন, এটি নিশ্চিত হয়ে বলা যাবে না যে, তিনি তোমাদের দিকে নাকি অন্য কোনো দিকে যাবেন। যাহোক, তোমরা পূর্ণ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হাতে নাও। আর আমি এই খবর দিয়ে তোমাদের প্রতি একটি অনুগ্রহ করতে চাইলাম। এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী, তিনি এই পত্র সাফওয়ান বিন উমাইয়া, সুহায়েল বিন আমর এবং ইকরামা বিন আবু জাহলের নিকট লিখেছিলেন।

অপরদিকে মহানবী (সা.)-এর গৃহীত দোয়ার বরকতে আল্লাহ্ তা'লা এই পত্রের কথা তাঁকে জানিয়ে দেন। অতএব তিনি (সা.) হযরত আলীকে ডাকেন। হযরত আলী নিজেই এই ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আল্লাহ্র রসূল (সা.) আমাকে ও আবু মারসাদ গানাভী এবং যুবায়েরকে পাঠান এবং আমরা সবাই অশ্বারোহী ছিলাম। তিনি (সা.) বলেন, তোমরা রওয়ানা হয়ে যাও, রাওযা খাখ নামক স্থানে পৌঁছে যাও। [এটি মদীনা ও মক্কার মধ্যবর্তী একটি স্থান।] সেখানে মুশরিকদের মধ্য থেকে একজন মহিলা থাকবে। তার কাছে হাতেব বিন আবি বালতার পক্ষ থেকে মুশরিকদের নামে লেখা একটি পত্র আছে। অতএব আমরা

তাকে সেই স্থানেই পেলাম যেখানে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) বলেছিলেন। সে তার উটে চড়ে যাচ্ছিল। আমরা বললাম, পত্র বের করো। সে বলে, আমার কাছে কোনো পত্র নেই। আমরা তার উট বসালাম এবং তল্লাশি করলাম, কিন্তু কোনো চিঠি আমাদের চোখে পড়ল না। আমরা বললাম, মহানবী (সা.) ভুল বলেন নি। তোমাকে সেই চিঠি বের করতে হবে, নতুবা আমরা তোমাকে বিবস্ত্র করব, তোমার কাপড় তল্লাশি করব। যখন সে কঠোরতা দেখে, তখন সে তার কোমরের দিকে ঝুঁকে; তার কোমরের চারপাশে একটি চাদর বাঁধা ছিল, আর সে সেটা বের করে দিয়ে দেয়। বুখারীর অন্য একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী, সে তার মাথার চুলের ভেতর থেকে সেটা বের করেছিল, অর্থাৎ দুটি রেওয়ায়েত রয়েছে। আমরা সেই মহিলাকে নিয়ে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর কাছে আসি। হযরত উমর বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এই ব্যক্তি (অর্থাৎ হাতেব, অর্থাৎ যে সাহাবী পত্র লিখেছিলেন, সে) আল্লাহ্, তাঁর রসূল ও মুমিনদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার শিরচ্ছেদ করি। মহানবী (সা.) হাতেবকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি যা করেছ তা করতে কোন বিষয় তোমাকে প্রবৃত্ত করেছে ? এই চিঠি কেন লিখেছ? হাতেব নিবেদন করেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমার কী হয়েছে যে, আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের উপর ঈমান আনয়নকারী গণ্য হবো না? অর্থাৎ আমি তো একজন ঈমানদার মানুষ আর এটা কোনো বিদ্রোহ নয়। তিনি বলেন, কারণ আমি চেয়েছিলাম, তাদের (অর্থাৎ কুরাইশের) ওপর আমার একটি অনুগ্রহ থাকুক, যার মাধ্যমে আল্লাহ্ আমার সন্তানসন্ততি ও সম্পদের সুরক্ষা করবেন। আর আপনার সাথিদের মধ্যে যারাই আছেন, তাদের সেখানে নিজ পরিবারের এমন কোনো ব্যক্তি অবশ্যই আছে, যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তার সন্তানসন্ততি ও সম্পদের সুরক্ষা করেন। মহানবী (সা.) বলেন, সে সত্য কথা বলেছে এবং তোমরাও তার সম্পর্কে ভালো কথা ছাড়া কিছু বলো না। অর্থাৎ, সে ঠিক বলেছে। সত্য কথা বলেছে, সরলতার বশবর্তী হয়ে এই কাজটি করেছে। মহানবী (সা.) হযরত উমরকে বলেন, সে কি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নি? মহানবী (সা.) আরো বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের জানেন আর তিনি বলেছেন, তোমরা যা চাও করো, তোমাদের জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে গেছে; অথবা বলেন, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি। এতে হযরত উমরের চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হয় এবং তিনি বলেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল ভালো জানেন।

এই ঘটনার উল্লেখ হযরত মুসলেহ মওউদও ইতিহাসের বিভিন্ন উদ্ধৃতিমূলে বর্ণনা করেছেন। তিনি লেখেন:

মহানবী (সা.)-এর যুগে একজন সাহাবী তার আত্মীয়দের কাছে মক্কায় মুসলমানদের আক্রমণ করার খবর গোপনে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছিলেন, যেন এই সহানুভূতি প্রকাশের কারণে তারা তার আত্মীয়দের সাথে ভালো ব্যবহার করে। কিন্তু মহানবী (সা.)-কে ওহীর মাধ্যমে এই বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া হয়। তিনি হযরত আলী ও আরো কয়েকজন সাহাবীকে পাঠান যে, অমুক স্থানে একজন মহিলা আছে, তার কাছে গিয়ে কাগজ নিয়ে এসো। তারা সেখানে পৌঁছে সেই মহিলার কাছে কাগজ চাইলে সে অস্বীকার করে। কিছু সাহাবী বলেন, হয়ত মহানবী (সা.)-এর ভুল হয়েছে। হযরত আলী বলেন, না, তাঁর (সা.) কথা কখনো ভুল হতে পারে না। এরূপ ছিল (তাঁর) ঈমান। যতক্ষণ না তার কাছ থেকে সেই কাগজ উদ্ধার হবে, আমি এখান থেকে সরব না। তারা সেই মহিলাকে ভর্ৎসনা করলে সে সেই কাগজ বের করে দিয়ে দেয়। অপর এক স্থানে তিনি আরো বিস্তারিতভাবে এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি লেখেন:

একজন দুর্বল সাহাবী মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে পত্র লিখে দেন যে, মহানবী (সা.) দশ হাজারের একটি সৈন্যবাহিনী নিয়ে বের হয়েছেন। আমার জানা নেই, তিনি কোথায় যাচ্ছেন; কিন্তু আমার ধারণা হলো, খুব সম্ভব তিনি মক্কার দিকে আসছেন। মক্কায় আমার কিছু প্রিয়জন ও আত্মীয় আছে; আমি আশা করি, তোমরা এই কঠিন মুহূর্তে তাদের সাহায্য করবে এবং তাদের কোনো ধরনের কষ্ট দেবে না। এই পত্র মক্কায় পৌঁছার পূর্বেই মহানবী (সা.) সকালে হযরত আলীকে ডেকে বলেন, অমুক স্থানে যাও। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে জানিয়েছেন, সেখানে উটে আরোহিত একজন মহিলাকে তোমরা পাবে। তার কাছে একটি পত্র থাকবে যা সে মক্কাবাসীদের কাছে নিয়ে যাচ্ছে। তুমি সেই পত্র সেই মহিলার কাছ থেকে নিয়ে নেবে এবং তৎক্ষণাৎ আমার কাছে চলে আসবে।

তাদের যাত্রার প্রাক্কালে মহানবী (সা.) বলেন, দেখো! সে নারী, (তাই) তার সাথে কঠোরতা করবে না। শুরুতেই কঠোরতা করবে না। চাপ দেবে এবং জোর দিয়ে বলবে যে, তোমার কাছে পত্র আছে। কিন্তু তারপরও যদি সে না মানে আর তোমার দোহাই দেওয়া বা কসম দেওয়ায়ও যদি কাজ না হয়, বিষয়টি যদি এমন পর্যায়ে পৌঁছে– তাহলে তোমরা কঠোরতাও প্রদর্শন করতো পারো। আর তাকে যদি হত্যা করতে হয় তবে হত্যাও করতে পারো, কিন্তু (কোনোভাবেই) পত্র যেতে দিবে না, পত্রটি আটকানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অতঃপর হযরত আলী (রা.) সেখানে পৌঁছান। (সেই) মহিলাও সেখানেই ছিল। সে কাঁদতে আরম্ভ করে আর কসম খেয়ে বলে, আমি কি বিশ্বাসঘাতক, প্রতারক? এমন কী হয়ে গেলো? তোমরা তল্লাশি করে দেখো। এরপর তারা সবকিছু খুঁজে দেখেন; তার থলে দেখেন, জিনিসপত্র দেখেন, (কিন্তু) পত্র পাওয়া যায় নি। সাহাবীরা বলেন, মনে হয়, তার কাছে পত্র নেই। হযরত আলী (রা.) উত্তেজিত হয়ে বলেন, তোমরা চুপ থাকো! প্রবল বিক্রমের সাথে বলেন, খোদার কসম! রসূল কখনো মিথ্যা কথা বলতে পারেন না। এরপর তিনি সেই মহিলাকে বলেন, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, তোমার কাছে পত্র আছে। আর খোদার কসম! আমি মিথ্যা কথা বলছি না। এরপর তিনি তরবারি বের করে বলেন, তুমি ভদ্রভাবে পত্রটি বের করে দাও নতুবা মনে রেখো! তোমাকে বিবস্ত্র করেও যদি তল্লাশি করতে হয় তবে আমি তোমার সাথে তা-ই করব। কেননা, মহানবী (সা.) সত্য কথা বলেছেন আর তুমি মিথ্যা বলছো। এতে সে ভয় পেয়ে যায়। আর তাকে যখন বিবস্ত্র করার হুমকি দেওয়া হয় তখন সে চট করে নিজের খোঁপা খোলে। সেই খোঁপার ভেতরে সে পত্রটি (লুকিয়ে) রেখেছিল যা সে বের করে দিয়ে দেয়। মাথার চুলের ভেতরে লুকিয়ে রেখেছিল।

যাহোক, এরপর মহানবী (সা.) যাত্রা আরম্ভ করেন। মহানবী (সা.)-এর মদীনা থেকে যাত্রা করা সম্পর্কে লেখা আছে, মহানবী (সা.) হযরত আবু রুহম কুলসুম বিন হুসেইন গিফারী (রা.)-কে মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন। ইবনে ইসহাকের মতে, তিনি (সা.) রমযানের দশদিন অতিবাহিত হবার পর মুহাজির, আনসার এবং আরবের গোত্রগুলোর সাথে যাত্রা আরম্ভ করেন। কিন্তু 'মুসনাদ আহমদ'-এর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি (সা.) ২রা রমযানে মদীনা থেকে যাত্রা করেন। বুখারীর ভাষ্যকার আল্লামা ইবনে হাজার দ্বিতীয় রমযান সংক্রান্ত রেওয়ায়েতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। যাহোক, এ যাত্রায় কিছু মানুষ ঘোড়ায় আর কিছু মানুষ উটে আরোহিত ছিল। মহানবী (সা.)-এর নেতৃত্বে এই সেনাবাহিনী যখন মদীনা থেকে যাত্রা আরম্ভ করেন তখন এতে প্রায় সাত হাজার চারশ বীর যোদ্ধা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। (এই দলে) বিভিন্ন গোত্র যেমন, বনু আসাদ, সুলায়েম প্রভৃতি মিলিত হবার কারণে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমনকি মক্কায় যেতে যেতে এই সংখ্যা দশ হাজারে উপনীত

হয়। মহানবী (সা.) **সুলসুল** নামক স্থানে পৌঁছেন, যা যুল হুলায়ফার সম্মুখে উচ্চভূমিতে 'বায়যা' নামক স্থানের পাশে একটি পর্বত ছিল। (সেখানে পৌঁছে) তিনি (সা.) হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.)-কে দু-শো অশ্বারোহীসহ সম্মুখে প্রেরণ করেন। কোনো কোনো গ্রন্থে এই সেনাদলের সংখ্যা বারো হাজারও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ রেওয়ায়েতে দশ হাজার উল্লেখ করা হয়েছে আর সেটিই বেশি সঠিক বলে মনে হয়। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই ঘটনাকে এভাবে বর্ণনা করেছেন:

মহানবী (সা.) এই সময়ে চতুর্দিকে মুসলমান গোত্রগুলোর প্রতি বার্তাবাহক প্রেরণ করেন। যখন এমন সংবাদ আসে যে, মুসলমান গোত্রগুলো প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে এবং মক্কাভিমুখে যাত্রাপথে (তারা) মিলিত হতে থাকবে, তখন তিনি (সা.) মদীনাবাসীদের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হবার নির্দেশ দেন। ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি তারিখে অর্থাৎ ৮ম হিজরীর ১০ই রমযানে এই সৈন্যবাহিনী মদীনা থেকে যাত্রা করে আর পথিমধ্যে চতুর্দিকের মুসলমান গোত্রগুলো এসে শামিল হতে থাকে। [হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) দশ রমযানই লিখেছেন।] কয়েক মঞ্জিল পথ অতিক্রম করার পর এই সেনাদল যখন 'ফারান'-এর অরণ্যে প্রবেশ করে তখন সুলায়মান নবীর ভবিষ্যদ্‌বাণী অনুযায়ী এই (সেনাদলের) সংখ্যা দশ হাজারে পৌঁছে গিয়েছিল।

এই যাত্রায় মহানবী (সা.)-এর সাথে পবিত্র সহধর্মিণীদের মধ্য থেকে হযরত উম্মে সালামা (রা.) ছিলেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েত অনুযায়ী উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মুনা (রা.)-ও সাথে ছিলেন। বুখারীর একটি রেওয়ায়েতে মহানবী (সা.)-এর কন্যা হযরত ফাতেমা (রা.)-রও উল্লেখ পাওয়া যায় যে, তিনিও সাথে ছিলেন। এই সফরটি রমযানে মাসে হয়েছিল। বিভিন্ন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়, সফরের প্রাথমিক কয়েকদিন মহানবী (সা.) রোযা রেখেছিলেন, কিন্তু এরপর তিনি (সা.) আর রোযা রাখেন নি, বরং অন্য সাহাবীদেরও রোযা রাখতে বারণ করেছেন। বুখারী শরীফে আছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, মহানবী (সা.) মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে রমযান মাসে যাত্রা করেন। (সেদিন) মহানবী (সা.) রোযা রেখেছিলেন। তিনি (সা.) যখন **'কুদায়েদ'** ঝরনার উপকণ্ঠে পৌঁছান তখন রোযা ভেঙে ফেলেন, এরপর তিনি (সা.) সেই মাসে আর রোযা রাখেন নি। **কুদায়েদ** ঝরনাটি কাদীদ ও উসফানের মধ্যবর্তী স্থানে এবং মক্কা থেকে বিয়াল্লিশ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। (এটি বুখারীর রেওয়ায়েত)।

বুখারী শরীফেরই আরেকটি রেওয়ায়েত যা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) রমযান মাসে মদীনা থেকে যাত্রা করেন এবং তাঁর সাথে দশ হাজার সৈন্য ছিল। আর (এ ঘটনাটি) তাঁর মদীনায় আগমনের সাড়ে আট বছরের শুরুর দিকে ঘটে এবং তিনি (সা.) মক্কাভিমুখে রওয়ানা হন। তিনি এবং মুসলমানদের মধ্য হতে যারা তাঁর সহযাত্রী ছিলেন তারা সকলে তাঁর সাথে রোযা রাখে। এরপর তিনি (সা.) **কাদীদ** নামক স্থানে পৌঁছান, এটি একটি ঝরনা যা উসফান ও **কুদায়েদের** মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। সেখানে তিনি (সা.) রোযা ভেঙে ফেলেন এবং (তাঁর) সহযাত্রীরাও রোযা ভেঙে ফেলেন। এ প্রসঙ্গে বুখারী শরীফের ভাষ্যকার আল্লামা ইবনে হাজার বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যেদিন মদীনা থেকে যাত্রা করেছিলেন সেদিন তিনি (সা.) রোযা ভেঙেছিলেন– এ ধারণাটি সঠিক নয়। কেননা মদীনা এবং কাদীদের মধ্যে কয়েক দিনের দূরত্ব ছিল। মহানবী (সা.) সাহাবীদের সাথে কোন স্থানে রোযা ভেঙেছেন এ বিষয়ে রেওয়ায়েতগুলোতে বিভিন্ন স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। কেউ কেউ তো একথাই বলে যে, (তাঁরা) কাদীদে রোযা ভেঙেছিলেন; কিন্তু বুখারী শরীফের

ভাষ্যকার আল্লামা আঈনী এর বিবরণ দিতে গিয়ে লেখেন, মহানবী (সা.) এই সফরে ঠিক কোথায় রোযা ভেঙেছিলেন এ সম্পর্কিত রেওয়ায়েতে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ কাদীদের স্থলে উসফান লিখেছে, কেউ আবার ‘কুরাউল গামীম’ (নামক স্থানের) উল্লেখ করেছে, কেউ কেউ **কুদায়েদ** লিখেছে। কাযী আইয়ায এক্ষেত্রে বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যে স্থানে রোযা ভেঙেছিলেন রেওয়ায়েতে সেই স্থান সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে যদিও সবগুলো রেওয়ায়েতে একই ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। সবগুলো স্থানই পরস্পর কাছাকাছি এবং উসফান (নামক) এলাকায় অবস্থিত।এই সফরের একটি ঘটনা হলো তিনি (সা.) ‘আরশ’ থেকে রওয়ানা হলে পথিমধ্যে তিনি (সা.) একটি মাদী কুকুর দেখেন যার ছানাগুলো দুধ পান করছিল। (প্রসঙ্গক্রমে) প্রাণীকূলের প্রতি (তাঁর) সহানুভূতির ঘটনাও এখানে চলে আসে। তিনি (সা.) হযরত জুয়ায়েল বিন সুরাকা (রা.)-কে নির্দেশ দেন, মাদী কুকুরটি যেখানে বসে আছে তিনি যেন সেখানে গিয়ে দাঁড়ান, যেন সেনাদলের কেউ কুকুরটিকে বা কুকুরছানাগুলোকে উত্যক্ত বা বিরক্ত না করে। মহানবী (সা.) গুপ্তচরদের আটক করার জন্য একটি অশ্বারোহী দল অগ্রবাহিনী হিসেবে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আর বনু খুযাআ গোত্রও কোনো পথিককে পথ দিয়ে যেতে দিচ্ছিল না। অর্থাৎ অন্য গোত্রও বাধা সৃষ্টি করে রেখেছিল। মহানবী (সা.)-এর প্রেরিত দলটি হাওয়াযিন গোত্রের এক গুপ্তচরকে আটক করে নিয়ে আসে। মহানবী (সা.) তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে বলে, হাওয়াযিন (গোত্র) আপনার বিরুদ্ধে সমবেত হচ্ছে। তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি সর্বোত্তম কার্যনির্বাহক। মহানবী (সা.) হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-কে আদেশ দেন, তিনি যেন এই গুপ্তচরকে আটকে রাখেন, যেন সে গিয়ে লোকদেরকে আগেভাগে সতর্ক করতে না পারে! তিনি (সা.) যখন **কুদায়েদ** পৌঁছান তখন সেখানে বনু সুলায়েম গোত্র, যাদের সংখ্যা ছিল এক হাজার, তারা তাঁর (সা.) সাথে যোগদান করে। এখানে তিনি (সা.) ঝান্ডা ও পতাকা প্রস্তুত করেন এবং সেগুলোকে বিভিন্ন গোত্রে বণ্টন করেন। কুদায়েদ ময়দানে নবী (সা.)-এর সেনাদলের প্রস্তুতি গোত্রভিত্তিক হয়। প্রত্যেক গোত্রের সেনাদলের অফিসার সেই গোত্রের ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হয়। রসূলুল্লাহ্ (সা.) আনসারকে গোত্রের ভিত্তিতে বারোটি দলে বিভক্ত করেন। ছয়টি দল অওস গোত্রের ও ছয়টি দল খাযরাজ গোত্রের। মুহাজিরদের তিনটি পতাকা হযরত আলী বিন আবি তালিব (রা.), হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.) ও হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-র কাছে ছিল। এই অভিযান চলাকালে আবু সুফিয়ান বিন হারেস ও আব্দুল্লাহ্ বিন আবি উমাইয়ার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা ঘটে। এই আবু সুফিয়ান ভিন্ন ব্যক্তি, আবু সুফিয়ান বিন হারব নয়। আবু সুফিয়ান বিন হারেস মহানবী (সা.)-এর চাচাতো ভাই এবং দুধ ভাই ছিল। সে নিজ পুত্র জাফর ও আব্দুল্লাহ্ বিন আবি উমাইয়া বিন মুগীরার সাথে মক্কা থেকে বের হয়। মহানবী (সা.)-এর সাথে মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী সানিয়্যাতুল উকাবে সাক্ষাৎ করে। তারা দুইজন মহানবী (সা.)-এর কঠোর শত্রু ছিল, তাই তাদের মহানবী (সা.)-এর সাথে সরাসরি সাক্ষাতের সাহস হয় নি। উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা.) যিনি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আবি উমাইয়ার বোন ছিলেন, তিনি নবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করেন, আপনার চাচাতো ভাই অর্থাৎ আবু সুফিয়ান বিন হারেস ও ফুফাতো ভাই এবং শ্বশুরবাড়ির আত্মীয় আব্দুল্লাহ্ তাঁর (সা.) সাথে সাক্ষাৎ করতে আগ্রহী। তিনি (সা.) বলেন, আমার তাদের কোনো প্রয়োজন নেই, আমি সাক্ষাৎ করতে আগ্রহী নই। আমার চাচাতো ভাই তো আমার অবমাননা করত। [সে (আবু সুফিয়ান) কবি ছিল এবং তাঁকে (সা.) ব্যঙ্গ করে কবিতা আবৃত্তি করত।] আর আব্দুল্লাহ্– মক্কায় হেন কোনো ন্যক্কারজনক কাজ নেই যা সে আমার বিরুদ্ধে করে নি!

আমার সাথে চরম শত্রুতা করেছে। আমি কীভাবে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারি? রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর এই উত্তর যখন আবু সুফিয়ান বিন হারেস জানতে পারে তখন সে আবেগের আতিশয্যে বলে, যদি মুহাম্মদ (সা.) আমার প্রতি সদয় না হন এবং সাক্ষাতের অনুমতি না দেন, তাহলে আমি এই সন্তানকে সাথে নিয়ে, (যেই পুত্রকে সাথে নিয়ে এসেছিল, তাকে নিয়ে) মরুভূমির দিকে বেরিয়ে পড়ব, এমনকি ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় মৃত্যুবরণ করব। মহানবী (সা.) যখন এই বিষয়টি জানতে পারেন তখন তিনি (সা.) এই দুইজনকে ডেকে পাঠান এবং সাক্ষাতের সম্মানে ভূষিত করেন। তৎক্ষণাৎ তাঁর মন নরম হয়ে যায়। তারা উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তারা নিষ্ঠাবান মুসলমান সাব্যস্ত হয়েছেন।

আবু সুফিয়ান বিন হারেসের পরিচয় হলো; যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি, এই আবু সুফিয়ান ভিন্ন ব্যক্তি। তার পরিচয় হলো, ইসলামের ইতিহাসে আবু সুফিয়ান নামের দুইজন ব্যক্তি অধিক প্রসিদ্ধ। একজন আবু সুফিয়ান মক্কার কুরাইশ নেতাদের সর্দার ছিল। সেই হিন্দের স্বামী ছিল, যে হযরত হামযার (রা.) কলিজা চিবিয়েছিল। এই ব্যক্তি আবু সুফিয়ান বিন হারব নামে সুপরিচিত। আর দ্বিতীয়জন হলো আলোচ্য ব্যক্তি, আবু সুফিয়ান বিন হারেস বিন আব্দুল মুত্তালিব। এই ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর চাচাতো ভাই ছিল। ইতিহাসবিদগণ কখনো কখনো নামের সাদৃশ্যের কারণে ভুল করে ফেলেন এবং আবু সুফিয়ান বিন হারেসের স্থলে আবু সুফিয়ান বিন হারব বর্ণনা করেন। যেমন, হুনায়েনের যুদ্ধে যখন মুসলমান বাহিনীর শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ে, লেখা রয়েছে, তখন আবু সুফিয়ান মহানবী (সা.)-এর খচ্চরের লাগাম অথবা রিকাব ধরে হুযূর (সা.)-এর সাথে দণ্ডায়মান ছিল। কিছু ইতিহাসবিদ তাকে আবু সুফিয়ান বিন হারব মনে করেছেন; অপরদিকে ইতিহাসবিদগণ বলেন, তিনি আবু সুফিয়ান বিন হারব ছিলেন না, বরং আবু সুফিয়ান বিন হারেস ছিলেন। তিনি হুযূর (সা.)-এর দুধ ভাইও ছিলেন, কেননা হালিমা সাদিয়া তাকেও দুধ পান করিয়েছিলেন।

মহানবী (সা.)-এর প্রতি তার গভীর ভালোবাসা ছিল। কিন্তু যখন তিনি (সা.) নবুয়্যতের দাবি করেন, তখন সে কঠোর বিরোধী ও শত্রুতে পরিণত হয়। সে মক্কার শীর্ষস্থানীয় কবিদের মাঝে গণ্য হতো। এই বিরোধিতার কারণে সে মহানবী (সা.)-এর অবমাননা করে ব্যঙ্গাত্মক কবিতা শুনাতো। হযরত হাসসান বিন সাবেত (রা.) তাঁর এই বিদ্রুপের উত্তর দিতেন আর তার কবিতার যেসব স্থানে বলা হতো, "এ কথা আবু সুফিয়ানকে জানিয়ে দাও"– এই বাক্য দ্বারা মূলত আবু সুফিয়ান বিন হারেসকেই বোঝানো হতো।।

তারিখ আল-খামীস নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে, আবু সুফিয়ান মহানবী (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলে: تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا لَخٰطِئِيْنَ অর্থাৎ ' আল্লাহ্‌র কসম! নিশ্চয় আল্লাহ্ আপনাকে আমাদের ওপর প্রাধান্য দান করেছেন, সত্যিই আমরা অপরাধী ছিলাম' (সূরা ইফসুফ:৯২)। উত্তরে মহানবী (সা.) বলেন:لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ অর্থাৎ, 'আজকের দিনে তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিন। বস্তুতঃ তিনি দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম দয়ালু (সূরা ইফসুফ:৯৩)। রেওয়ায়াতে অনুসারে হযরত আলী (রা.) আবু সুফিয়ানকে বলেছিলেন, তুমি মহানবী (সা.)-এর সামনে উপস্থিত হয়ে এই বাক্য বলে তাঁর (সা.) কাছে ক্ষমা চাও। রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, আবু সুফিয়ান যখন মহানবী (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হয় তখন লজ্জা ও সংকোচের কারণে নিজের মাথা তুলতে পারছিল না। যাহোক, আবু সুফিয়ান বিন হারেস (রা.), যে পূর্বে একসময় মহানবী (সা.)-কে অবমাননা করে কবিতা আবৃত্তি করত, ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর সমস্ত

কবিতা মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসা ও ভক্তিতে ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি মহানবী (সা.)-এর প্রশংসায় একটি কাসীদা লেখেন।

মহানবী (সা.)-এর অবয়ব যে কতিপয় লোকদের সাথে মিলত, তাদের মধ্যে আবু সুফিয়ান বিন হারেসও অন্যতম। মহানবী (সা.) তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। তিনি শ্রেষ্ঠ সাহাবীদের মাঝে গণ্য হতেন। তিনি অত্যন্ত উন্নতমানের মুসলমান ছিলেন। মৃত্যুর তিন দিন আগে তিনি নিজেই নিজের কবর খোঁড়েন এবং যখন মৃত্যুর সময় চলে আসে তখন বলেন, কেউ যেন আমার জন্য না কাঁদে, কারণ যেদিন আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, সেদিন থেকে আমি আমার জীবনকে কোনোভাবে পাপে কলুষিত হতে দিই নি। মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুতে তিনি এক মর্মস্পর্শী শোকগাথা রচনা করে নিজের আবেগের বহিঃপ্রকাশ করেন, যার কিছু পংক্তির অনুবাদ হলো,

আমি ছটফট করছি এজন্য যে, আমার রাত শেষ হচ্ছে না, আর বিপদগ্রস্ত মানুষের রাত তো দীর্ঘই হয়ে থাকে। ক্রন্দন আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছে, যদিও এই অশ্রু সেই বিপদের তুলনায় কিছুই না যা মুসলমানদের ওপর নেমে এসেছে। যে সন্ধ্যায় মহানবী (সা.)-এর মৃত্যু হয়, সেই সন্ধ্যায় আমাদের জন্য বিপদ আরো বেড়ে যায়, আরো ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। আমাদের স্বদেশ যে সমস্যায় নিপতিত হয়েছে সেকারণে আমাদের নিয়ে এটির উল্টে যাবার উপক্রম হয়। আরো লেখেন,

মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ওহী বন্ধ হয়ে গেল এবং কুরআন, যা জিবরাঈল (আ.) সকাল-সন্ধ্যা নিয়ে আসতেন, তা নাযিল হওয়া বন্ধ হয়ে গেল। তিনি হযরত ফাতেমা (রা.)-কে সম্বোধন করে একটি কবিতায় লেখেন, হে ফাতেমা! তুমি যদি এই মুহূর্তে কাঁদো, তাহলে তোমার কান্না যথার্থ; আর যদি না কাঁদো, তাহলে সেটাই সঠিক পন্থা। তুমি ধৈর্য ধারণ করো, কারণ এতে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অনেক বড়ো প্রতিদান রয়েছে আর এটি অনেক বড়ো একটি কৃপা। তুমি তোমার পিতা মহানবী (সা.)-এর গুণাবলি বর্ণনা করো, তাঁর প্রশংসায় ক্লান্ত হয়ো না; কারণ তাঁর যত প্রশংসাই করা হোক না কেন, তাঁর মহত্ব কখনোই পুরোপুরি তুলে ধরা সম্ভব নয়। তার কাসীদায় এক স্থানে তিনি বলেন:

فقبر أبيك سيد كل قبر

وفيه سيد الناس الرسول

অর্থাৎ, হে ফাতেমা তোমার বাবার কবর সকল কবরের চেয়ে বেশি পবিত্র, কেননা এতে মহানবী (সা.) সমাহিত আছেন যিনি সমগ্র মানবজাতির নেতা। হযরত আবু সুফিয়ানের মৃত্যু ১৫ হিজরী অথবা ২০ হিজরী সনে হয়েছিল। হযরত উমর (রা.) তার জানাযার নামায পড়িয়েছিলেন। অপর ব্যক্তি আবদুল্লাহ্ বিন উমাইয়ার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি হলো, তার নাম হুযাইফা বর্ণিত হয়েছে। তিনি মহানবী (সা.)-এর ফুফু আতিকার পুত্র ছিলেন। এদিক দিয়ে তিনি মহানবী (সা.)-এর ফুফাতো ভাই ছিলেন এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামার ভাই ছিলেন। তিনি (সা.) যখন নবুয়্যতের দাবি করেন তখন সে মহানবী (সা.)-এর কঠোর বিরোধী হয়ে যায় আর বিরোধিতায় অত্যন্ত অগ্রণী ভূমিকা রাখে। পবিত্র কুরআনে বলা আছে,

وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا (সূরা বনী ইসরাইল: ৯১)

আর তিনি এটিও বলেন, আমরা কখনো তোমার কোনো কথা শুনব না, যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য ভূমি থেকে কোনো ঝরনাধারা প্রবাহিত করবে।

কথিত আছে, এই বাক্য আবদুল্লাহ্ বিন আবু উমাইয়াই বলেছিল। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি অত্যন্ত বীরত্বের সাথে হুনায়নের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন এবং তায়েফের যুদ্ধে একটি তির বিদ্ধ হয়ে শাহাদাত বরণ করেন।

এ অভিযানে হযরত আব্বাসের ইসলামী সেনাবাহিনীতে যোগ দেবার বিষয়ে লেখা আছে, মহানবী যখন (সা.) মক্কা অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন তখন হযরত আব্বাস মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের উদ্দেশ্যে সফরের প্রস্তুতি নেন। হযরত আব্বাস জুহফায় মহানবী (সা.)-এর সাথে মিলিত হন। জুহফা মক্কা থেকে ৭৬ মাইল দূরে অবস্থিত। হযরত আব্বাস নিজ সাজসরঞ্জাম মদীনায় পাঠিয়ে দেন। আর নিজে মহানবী (সা.)-এর সাথে মক্কা অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন।

হযরত আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবের সংক্ষিপ্ত পরিচয় হলো, হযরত আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব মহানবী (সা.)-এর চাচা ছিলেন। মহানবী (সা.)-এর চেয়ে তিনি দুই বা তিন বছরের বড়ো ছিলেন। তার ছেলে ফযল বিন আব্বাসের কারণে আবুল ফযল নামে খ্যাত ছিলেন। হযরত আবু তালেবের পর সিকায়া অর্থাৎ হাজীদের পানি পান করানোর দায়িত্ব তার হাতে ন্যস্ত ছিল। আকাবা নামক স্থানে যখন আনসারের বয়আত নেওয়া হয় তখন হযরত আব্বাস তাঁর (সা.) সাথে ছিলেন আর হুনায়নের যুদ্ধে অবিচলতার সাথে তিনি মহানবী (সা.)-এর সঙ্গ দেন। ৩২ হিজরী অথবা ৩৩ হিজরী সনে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। হযরত আব্বাসের ইসলাম গ্রহণের বিষয়ে বিভিন্ন রেওয়ায়েত বিদ্যমান। কারো কারো মতে তিনি হিজরতের পূর্বে ইসলাম কবুল করেছিলেন, কারো কারো মতে বদরের যুদ্ধের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, কারো কারো মতে খায়বারের যুদ্ধের নিকটবর্তী সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন; আর কেউ বলেন, মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবের গবেষণা অনুযায়ী আকাবার দ্বিতীয় বয়আত অবধি তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন নি। যেমন তিনি আকাবার দ্বিতীয় বয়আতের বিষয়ে লেখেন, মহানবী (সা.) তার চাচা আব্বাসকে সাথে নেন যিনি তখনও মুশরিক ছিলেন, কিন্তু তাঁকে (সা.) অনেক ভালোবাসতেন। খুব সম্ভবত, হযরত আব্বাস বদরের যুদ্ধের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করে থাকবেন। যদিও এই বিষয়ে সকল ইতিহাসবিদ ও জীবনীকার একমত যে, তিনি মক্কাতেই ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করেন নি যেন মক্কা ও মক্কাবাসীদের খবরাখবর মহানবী (সা.)-এর কাছে পৌঁছতে থাকে। আর রেওয়ায়েতে এটিও দেখা যায়, মহানবী (সা.) হযরত আব্বাসকে বলেন যে, আপনার মক্কায় অবস্থান করা অধিক লাভজনক।

মক্কা বিজয়ের বিষয়ে হযরত আবু বকর (রা.) একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন যা এভাবে উল্লেখ হয়েছে, হযরত আবু বকর মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিজ স্বপ্ন বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আমাকে স্বপ্ন দেখানো হয়েছে আর আমি স্বপ্নে আপনাকে দেখেছি, আমরা মক্কার কাছে এসে গেলে একটি কুকুর ঘেউ ঘেউ করতে করতে আমাদের দিকে আসল। যখন আমরা সেটির কাছে গেলাম তখন সে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল আর এর স্তন থেকে দুধ প্রবাহিত হতে থাকল।

এর ব্যাখ্যায় মহানবী (সা.) বলেন, মক্কাবাসীদের অনিষ্ট দূর হয়ে গেছে আর তাদের পক্ষ থেকে কল্যাণ লাভের ক্ষণ অতি নিকটে। [মহানবী (সা.) এই ব্যাখ্যা করেন।] তারা তোমার নৈকট্যের দোহাই দিয়ে তোমার কাছে নিরাপত্তা চাইবে আর তুমি তাদের কতিপয়ের সাথে সাক্ষাৎ করবে। [তিনি (সা.) ব্যাখ্যা করেন, তারা তোমার আত্মীয়তার কারণে তোমার

নিরাপত্তায় আসবে এবং তুমি তাদের মধ্য হতে কতিপয় ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করবে।] এরপর তিনি (সা.) হযরত আবু বকরের উদ্দেশ্যে বললেন, তুমি যদি আবু সুফিয়ানকে পাও, তবে তাকে হত্যা করো না। [সে ভিন্ন এক আবু সুফিয়ান।] যাহোক, তখন মহানবী (সা.)-এর সৈন্যদল যাত্রা অব্যাহত রাখে এবং **মাররুয যাহরান** নামক স্থানে তিনি (সা.) শিবির স্থাপন করেন।

ইতিহাসে লেখা আছে, মহানবী (সা.)-এর চমৎকার সামরিক কৌশল ও দোয়ার বরকতে এত বড়ো এক অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হয় যে, মদীনা থেকে যাত্রাকারী দশ হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনী প্রায় ৪০০ কিলোমিটার অতিক্রম করে মক্কা শহরের মাত্র পাঁচ মাইল দূরত্বে এসে অবস্থান গ্রহণ করে, অথচ তখনও মক্কার লোকজনের কাছে বিন্দুমাত্র খবরও পৌঁছায় নি।

মহানবী (সা.) মাররুয যাহরান নামক স্থানে এশার সময় যাত্রাবিরতি করেন, যা মক্কা ও উসফান-এর মাঝে মক্কা শহর থেকে মাত্র পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত একটি স্থান। তিনি (সা.) নিজ সাহাবীদের নির্দেশ দেন আর তারা দশ হাজার আগুন প্রজ্বলিত করে, আর তিনি (সা.) হযরত উমর (রা.)-কে এই বিশাল বাহিনীর তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নিযুক্ত করেন।

ইসলামী বাহিনী কীভাবে সবার অজ্ঞাতসারে মক্কা পর্যন্ত পৌঁছে গেল– হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এ বিষয়ে লিখেছেনঃ আহযাবের যুদ্ধ ছাড়া আরবের ইতিহাসে এত বড়ো বাহিনী কখনো প্রস্তুত হয় নি। আহযাবে দশ-বারো হাজার সৈন্য ছিল। বস্তুত ইসলামের ইতিহাসে মুসলমানদের এটা ছিল দ্বিতীয় বৃহৎ বাহিনী। এত বড়ো বাহিনী মদীনা থেকে রওয়ানা দেয়, অথচ কেউ এর বিন্দুমাত্র খবরও পায় নি। আবার আল্লাহ্ তা'লা এক অলৌকিক উপায়ে প্রমাণ করে দেখান, আমি আমার বাদ্যঘরে সুরলহরি তুলছি আর তাদের বাদ্যঘর ধ্বংস করে দিচ্ছি। অতএব মহানবী (সা.) যখন মদীনা থেকে রওয়ানা দেন তখন বলেনঃ হে আমার প্রভু! আমি তোমার কাছে দোয়া করি, তুমি মক্কার লোকদের কান বধির করে দাও এবং তাদের গুপ্তচরদের অন্ধ করে দাও, তারা যেন আমাদের দেখতে না পায় আর আমাদের কোনো সংবাদ যেন তাদের কানে না পৌঁছায়।

বস্তুতঃ মহানবী (সা.) যখন রওয়ানা হন, তখন মদীনায় শত শত মুনাফিক উপস্থিত ছিল। কিন্তু দশ হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনী মদীনা থেকে বের হওয়া সত্ত্বেও মক্কায় কোনো খবর পৌঁছায় না। (প্রথমে) যদিও সাত হাজার লোক ছিল, তবুও এই সংখ্যা ছিল বিশাল। পথে আরো লোকজন এই বাহিনীতে যোগ দেয়, তবুও মদীনার মুনাফিকদের মক্কায় পাঠাতে পারে।

যেমনটি বলা হয়েছে, তখনও পর্যন্ত কুরাইশ বা মক্কার অধিবাসীরা জানতই না, মহানবী (সা.) রওয়ানা হয়েছেন, এমনকি মক্কার এত কাছে পৌঁছে গিয়েছেন। তাদের এই আশঙ্কা অবশ্যই ছিল যে, তিনি তাদের ওপর আক্রমণ করতে পারেন; কিন্তু তারা এটা আশা করে নি যে, মুসলমানরা তাদের ওপর আক্রমণ করে বসবে। অবশ্য মক্কাবাসীরা কিছুটা সতর্ক হয়ে গিয়েছিল এবং রাতে আশপাশের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করার মানসে টহল দিত।

এভাবে এক রাতে আবু সুফিয়ান মক্কার দুই নেতা হাকীম বিন হিযাম এবং বুদায়েল বিন ওয়ারাকাকে নিয়ে টহল দিচ্ছিল। তারা সৈন্যবাহিনীর তাঁবু এবং আগুন দেখতে পায়। তাদের কাছে এগুলো আরাফাতের আগুনের মতো মনে হয়। তারা পরস্পর অনুমান করে বলতে থাকে, সম্ভবত এরা বনু কা'ব (বা খুযাআ) গোত্রের লোকজন হবে যাদেরকে সাম্প্রতিক যুদ্ধ ক্ষেপিয়ে তুলেছে। পরে নিজেরাই এই ধারণা বাতিল করে দিয়ে বলে, না, তাদের সংখ্যা

তো এত বেশি নয়। তারা হতে পারে না। পরে তারা বলে, তাহলে মনে হয় হাওয়াযিন গোত্র! আবার নিজেরাই তা নাকচ করে দিয়ে বলে, তারাও হতে পারে না। এইভাবে তারা অনুমান করে যাচ্ছিল, এমন সময় তারা ঘোড়ার হ্রেষা ও উটের আওয়াজ শুনতে পায়। এতে তারা প্রচণ্ডভাবে ভীত হয়ে পড়ে। তারা এই আলোচনাই করছিল, তখন মহানবী (সা.)-এর গোয়েন্দারা, যারা আশপাশের পরিস্থিতি নজরে রাখছিল এবং প্রহরায় ছিল, তারা তাদের ধরে ফেলে এবং মহানবী (সা.)-এর সামনে উপস্থিত করে।

একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী, আল্লাহ্ তা'লা দিব্যদর্শনে মহানবী (সা.)-কে আবু সুফিয়ানের কাছে আসার খবর জানিয়ে দিয়েছিলেন। হযরত আবু লায়লা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, আমরা মাররুয যাহরান নামক স্থানে তাঁর সঙ্গী ছিলাম। তিনি (সা.) বলেন, আবু সুফিয়ান আরাকে অবস্থান করছে, যা মক্কার নিকটবর্তী একটি উপত্যকা। তাকে ধরে নিয়ে আসো। আমরা সেখানে যাই এবং তাকে ধরে ফেলি। ইবনে উকবা লেখে, আবু সুফিয়ান, হাকীম বিন হিযাম এবং বুদায়েল বিন ওয়ারাকা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারে নি। এক পর্যায়ে সাহাবীদের এই দল তাদেরকে গিয়ে ধরে ফেলে যাদেরকে তিনি (সা.) গোয়েন্দা হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। তারা তাদের উটের লাগাম ধরে ফেলেন। আবু সুফিয়ান ও তার সাথিরা জিজ্ঞেস করে, তোমরা কারা? তারা উত্তরে জানান, তারা মহানবী (সা.)-এর সাহাবী। আবু সুফিয়ান বলে, কখনো কি এমনটি হয়েছে যে, এত বিরাট সৈন্যদল কোনো জনবসতিতে প্রবেশ করবে অথচ তারা জানতেই পারবে না? অজ্ঞাতে এত বড়ো সৈন্যদল কীভাবে আসতে পারে? অপর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী, মহানবী (সা.) যখন মাররুয যাহরান নামক স্থানে পৌঁছান তখন হযরত আব্বাস (রা.)-র হৃদয় মক্কাবাসীর জন্য গলে যায়। তিনি মহানবী (সা.)-এর 'শাহবা' নামক সাদা খচ্চরে আরোহণ করে আরাক পর্যন্ত আসলেন এবং ভাবলেন, কোনো ব্যক্তির সাথে হয়ত দেখা হয়ে যাবে, যে মক্কাবাসীদেরকে মহানবী (সা.)-এর আগমনের সংবাদ প্রদান করবে এবং মহানবী (সা.)-এর জোরপূর্বক মক্কায় প্রবেশের আগে যেন তারা মহানবী (সা.)-এর নিকট এসে নিরাপত্তা ভিক্ষা চায়। তিনি তখনো এসব কথা মনে মনে ভাবছিলেন, ইত্যবসরে তিনি আবু সুফিয়ান, হাকীম বিন হিযাম এবং বুদায়েল বিন ওয়ারাকার কণ্ঠস্বর শুনতে পান। আবু সুফিয়ান বলছিল, আমি আজ পর্যন্ত এমন আগুনও দেখি নি কিংবা এমন সৈন্যবাহিনীও দেখি নি। বুদায়েল বলছিল, আল্লাহ্‌র কসম! এটি খুযাআর লোকদের আগুন। যুদ্ধের উদগ্র বাসনা তাদের ক্ষেপিয়ে তুলেছে। আবু সুফিয়ান বলে, আল্লাহ্‌র কসম! খুযাআ দুর্বল এবং সংখ্যায় স্বল্প। এটি তাদের আগুন এবং তাদের সৈন্যদল হতে পারে না। হযরত আব্বাস (রা.) তাদের কথাবার্তা শুনে ফেলেন এবং তাদেরকে চিনে ফেলেন আর আবু সুফিয়ানও তাকে চিনে ফেলে। হযরত আব্বাস তখন আবু সুফিয়ানকে মহানবী (সা.)-এর কাছে নিয়ে যান আর তার দুই সাথি ফেরত চলে আসে। তিনি একা আবু সুফিয়ানকে নিয়ে আসেন এবং অন্য সাথিদের ছেড়ে দেন। আরেকটি রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আব্বাস (রা.) তাদেরকেও মহানবী (সা.)-এর নিকট নিয়ে আসেন। দুধরনের রেওয়ায়েত বিদ্যমান।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এর উল্লেখ এভাবে করেন যে,

একদিকে তো মুসলমানদের এই সৈন্যবাহিনী মক্কাভিমুখে কুচকাওয়াজ করে এগিয়ে যাচ্ছিল এবং অন্যদিকে মক্কাবাসীরা পরিবেশে বিরাজমান নিস্তব্ধতার কারণে ক্রমাগত ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ছিল। পরিশেষে তারা পরামর্শ করে আবু সুফিয়ানকে মক্কার বাইরে গিয়ে খোঁজ নিতে সম্মত করে যে, মুসলমানরা কী চায়? মক্কা থেকে এক মঞ্জিল দূরে যেতেই আবু সুফিয়ান

রাতের বেলা মরুভূমিকে আগুনে আলোকিত দেখতে পায়। মহানবী (সা.) সকল তাঁবুর সামনে আগুন জ্বালানোর নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন। যুদ্ধে দশ হাজার মানুষের তাঁবুর সামনে প্রজ্বলিত আগুন এক ভয়ঙ্কর দৃশ্যের অবতারণা করছিল। আবু সুফিয়ান তার সঙ্গীসাথিদের জিজ্ঞেস করে, এটি কী? আকাশ থেকে কোনো সৈন্যদল অবতরণ করল নাকি? কেননা আরবের কোনো জাতির নিকট এত বড়ো সেনাদল নেই। তার সঙ্গীরা বিভিন্ন গোত্রের নাম বলল; কিন্তু সে বলল, না, না; আরবের গোত্রসমূহের মাঝে কোনো জাতিরই এত বড়ো সেনাদল নেই। তারা এসব কথাবার্তায় লিপ্ত ছিল, ইত্যবসরে অমানিসার গর্ভ থেকে শব্দ কানে আসে, আবু হানযালা! এটি আবু সুফিয়ানের ডাক নাম ছিল। আবু সুফিয়ান বলল, আব্বাস! তুমি এখানে কী করছ? তিনি উত্তরে বলেন, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সেনাবাহিনী সামনেই আছে। আর তোমরা যদি দ্রুত কোনো পরিকল্পনা না করো তাহলে পরাজয় এবং লাঞ্ছনা তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। এর অর্থ হলো, সন্ধির দিকে আসো।

যাহোক, এর বিস্তারিত বিবরণ পরে আসবে। বেশ দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে, আমি আগামীতে বর্ণনা করব, ইনশাআল্লাহ্। আমি সবসময় যেভাবে বলে থাকি, দোয়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করুন। আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীকে নৈরাজ্য থেকে রক্ষা করুন। আর বর্তমানে উত্থান-পতনের যে খেলা চলছে, আল্লাহ্ তা'লা তা ঠিক করুন। এটি যেন ধ্বংসের দিকে না গিয়ে নিরসনের দিকে যায়।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)